ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

অনুবাদ

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ
কামালউদ্দিন খান
মোহাম্মদ মোকসেদ আলী
অধ্যাপক সাইদুর রহমান
আবদুল হক

সূচিপত্র

১. প্রসঙ্গ কথা : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ..... ০৯

২. ভূমিকা..... ২১

৩. জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা..... ২৩

৪. দর্শনের চোখে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা..... ৫৫

৫. আল্লাহ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম..... ৯৫

৬. মানুষের খুদী : তার আযাদী ও অমরতা..... ১২৯

৬. মুসলিম তমদ্দুনের মর্মকথা..... ১৬৩

৭. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় গতিশীলতা..... ১৮৭

৮. ধর্ম কী সম্ভব?..... ২২৫

৯. পরিভাষা..... ২৪৫

প্রসঙ্গ কথা

এ উপমহাদেশে মহাকবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের আবির্ভাব সত্যিই এক দিক-দর্শনের মতো। ইতোপূর্বে যেসব মহামানব ও মহামনীষী এদেশের বুকে জন্মগ্রহণ করে তাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মানব-জীবনের এক-একটা বিশিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা ও প্রচার করেছেন। ইসলামী জীবনধারায় অতিমাত্রায় প্রত্যয়শীল আল্লামা ইকবাল জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সে আলোচনার ফল তাঁর বিভিন্ন রচনায় রেখে গেছেন।

তিনি ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ এবং মরমীবাদী। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র ব্যাপক ও গভীরতর ছিলো বলে- প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর জীবনদর্শনের ছাপ রেখে গেছেন। এ উপমহাদেশের ইতিহাসে ইসলামী চিন্তাধারার সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন শায়খ আহমদ সারহিন্দি। তিনি একদিকে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত নানাবিধ বিদআতের বিরুদ্ধে যেমন সংগ্রাম করেছিলেন, তেমনি শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আলী আল-আরাবী প্রবর্তিত 'হামা উস্ত' নামক মতবাদের বিকৃত রূপের বিরুদ্ধেও সত্যিকার ইসলামী মতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে- 'হামা আয উস্ত' নামীয় মতবাদের প্রবর্তন করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ.) ইসলামের তত্ত্বীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক নিয়ে গবেষণা করে তার ফল প্রচার করেছেন। সেই ক্রান্তিকালে তার মতো মহামনীষীর আবির্ভাব না হলে এ উপমহাদেশে ইসলামের যে কি দশা হতো-তা কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে।

তবে এ দু'জন মহামানবের চিন্তাধারা ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ধর্মের নানাবিধ ধ্যান-ধারণার

সঙ্গে ইসলামের কোনো তুলনামূলক আলোচনা করেননি। এঁরা দু'জনেই ইসলামী ভাবধারাকে পরিচ্ছন্ন করার জন্যে সাধনা করেছেন।

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী পূর্বেই পূর্বোক্ত ধারার প্রবর্তন করেন। মনীষার ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিত পূর্বে নানাদিক থেকেই ইসলামের উপর প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে আঘাত হানার চেষ্টা চলতে থাকে। মুসলিমগণ কর্তৃক সিরিয়া ও ইরান বিজিত হওয়ার পর থেকে, উত্তরদিক থেকে গ্রীক চিন্তাধারা এবং অপরদিক থেকে ভারতীয় চিন্তাধারা ইসলামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আব্বাসী খলীফা আবদুল্লাহ আল-মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) বাগদাদে একাডেমী অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা করলে, মুসলিমরা দেশ-বিদেশের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কতকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার কারণও সুস্পষ্ট। গ্রীক চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তার কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ইসলামী চিন্তাধারার সঙ্গে তার কোনো ঐক্যই নেই। গ্রীক ও ভারতীয় উভয় চিন্তাধারায় জড় পদার্থকে চিরন্তন বলে ধারণা করা হয়েছে। গ্রীক চিন্তানায়কদের চিন্তার মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই। জড় ও আকারের অথবা নির্বিশেষের সঙ্গে জড়ের সংযোগের ফলেই এ বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি বলে এ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ধারণা ছিল।

ভারতীয় চিন্তাধারায় সৃষ্টির অর্থ সমবায়। অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের শেষে যখন এ জগতের উপাদানগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন সেগুলোকে পুনরায় বিন্যাস করারই অপর নাম সৃষ্টি। অথচ সবগুলো হিব্রুধর্মে সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে শূন্য থেকে সৃষ্টি- Creation out of nothing। তেমনি মানব-জীবনে বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করে তারই আলোকে এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হওয়া ছিলো গ্রীকদের লক্ষ্য। ভারতে বিচার বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে বটে, তবে শুধুমাত্র বুদ্ধির দৌলতে সত্যিকার জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয় বলেও ধারণা রয়েছে। বুদ্ধির প্রয়োগের পূর্বে মানব-অন্তরের মধ্যে বিরাজমান নানাবিধ অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশকে অত্যাবশ্যক বলে ধারণা করা হয়েছে। তার উপর স্বজ্ঞা বা Intuition-কে জ্ঞানের কাজে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে কিন্তু মানব-জীবনে বুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি নয়। মানব-জীবনে ইচ্ছা বা Will-ই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধি

ভূমিকা

পবিত্র গ্রন্থ কোরআন নিছক 'আদর্শ-প্রীতি'র চেয়ে 'কর্মে'র উপরই বেশি জোর দিয়েছে। অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাস মূলত যে বিশিষ্ট প্রকারের সুগভীর জীবন্ত চেতনার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, অনেক মানুষের পক্ষে তা সত্যিকারভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া আজকের মানুষের চিন্তারীতি বাস্তবমুখী। অবশ্য ইসলাম নিজেও তার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রথম দিকে বাস্তবমুখিতাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিল। আজকের মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে সন্দেহ করে এ জন্য যে, সে অভিজ্ঞতা অলীক বা ভ্রান্ত হতে পারে। অবশ্য মুসলিম সূফীদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ধর্মীয় অনুভূতির ক্রমবিকাশকে প্রকৃত রূপ এবং গতি-নির্দেশ দেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ করে গেছেন; কিন্তু তাঁদের পরবর্তীরা আধুনিক মন সম্বন্ধে অবজ্ঞার দরুন বর্তমানকালের চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতাবলি থেকে কোন নতুন প্রেরণা লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম রয়ে গেছেন। এমন সব রীতি-নীতিকে তাঁরা চিরন্তন মনে করে আঁকড়ে ধরে আছেন, যেগুলোর উদ্ভাবন হয়েছিল আমাদের আজকের সংস্কৃতি থেকে অনেকাংশে পৃথক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কোরআনে ঘোষিত হয়েছে : 'তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবন একটিমাত্র আত্মার সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের ন্যায়'। এ বাক্যে যে জৈবিক ঐক্যের উল্লেখ রয়েছে তাকে প্রাণবন্তরূপে বুঝতে হলে আজকের বাস্তবাশ্রয়ী মনের জন্য শরীর-তাত্ত্বিক বিচার প্রণালীর চেয়ে বেশি প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিক বিচার-প্রণালী। যেখানে সে রকম বিচার-প্রণালীর অভাব সেখানে স্বভাবতঃই ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানসম্মত রূপ চাওয়ার দাবি উঠবে। এই বক্তৃতাবলিতে আংশিকভাবে হলেও আমি সে দাবি পূরণের চেষ্টা

করেছি। এতে আমি মুসলিম দার্শনিক ঐতিহ্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে এবং বর্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মুসলিম ধর্মীয় দর্শনকে পুনর্গঠনের প্রয়াস পেয়েছি। এ কাজের জন্যে বর্তমান সময়ই বিশেষভাবে উপযোগী। প্রাগাধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান আজ নিজেরই ভিত্তিমূলের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে আরম্ভ করেছে। এর ফলে গোড়াতে তার যে ধরনের বস্তুবাদের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তা দ্রুত অন্তর্ধান করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রে নবতর মিলনভূমি আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দার্শনিক চিন্তা জগতে পরিপূর্ণতা কখনোই আসতে পারে না। জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে চিন্তাধারার নতুন নতুন পথ যখন খুলে যাবে, তখন আজ আমি যা বলছি তার থেকে ভিন্ন, এমনকি তার চেয়ে অধিকতর যুক্তিসহ মতামত উদ্ভাবিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, মানুষের চিন্তাধারার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি এবং তার সম্বন্ধে একটি স্বাধীন সমালোচনামূলক মনোভাব রক্ষা করে চলা।

মুহাম্মদ ইকবাল

এক.
জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা

আমরা যে বিশ্বে বাস করি, তার চরিত্র ও স্বরূপ কী? এ বিশ্ব চরাচরের আবয়িক সংগঠনে কি কোনো নিত্যস্থায়ী উপাদান আছে? আমাদের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? আর আমরা এ জগতের যে স্থানটি অধিকার করে আছি, আমাদের কোন ধরনের কাজ তার উপযুক্ত? ধর্ম, দর্শন এবং উচ্চাঙ্গের কাব্যের এটাই হলো সাধারণ জিজ্ঞাসা। কিন্তু কাব্যিক প্রেরণা যে জ্ঞানের আলো দান করে, তার প্রকৃতি একান্তই ব্যক্তিগত, আর এই জ্ঞান রূপক, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। ধর্ম তার অধিকতর প্রাগ্রসর চিন্তার জন্যে কাব্যকে অতিক্রম করে এবং ব্যক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজের গণ্ডিতে উপনীত হয়। পরম সত্যের প্রতি এর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে ধর্ম মানুষের সসীমতাকে অস্বীকার করে এবং মানুষের সেই দাবিকে বাড়িয়ে দেয় এবং এ সম্ভাবনাকে মেনে নেয় যে, মানুষ সেই সত্যের নিকটবর্তী হতে পারে। তা হলে জিজ্ঞাসা, দর্শনের নিছক যুক্তিবাদ ধর্মে প্রয়োগ করা চলে কি না?

দর্শন শাস্ত্রের মোদ্দা কথাই হচ্ছে মুক্ত জিজ্ঞাসা। যাবতীয় সনাতন বিধি-নিষেধের কর্তৃত্বকে দর্শন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। মানুষের চিন্তাজগতে যেসব অন্ধ ধারণা থাকে, সেই সকল ধারণার গোপন উৎস ও আশ্রয়স্থানগুলো খুঁজে বের করাই দর্শনের কাজ। এভাবে খোঁজ করতে করতে দর্শন এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারে যে, পরম সত্তা বলে আদৌ কিছু নেই; আর যদিও বা থাকে, তবে নিছক যুক্তির মাধ্যমে তাকে বুদ্ধিগোচর করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ধর্মের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ঈমান; বুদ্ধির মোহমুক্ত এই ঈমান পাখির মতো তার সামনে চেয়ে দেখে বন্ধনহীন পথ। ইসলামের মহান মরমী কবির ভাষায়, বুদ্ধি মানুষের জীবন্ত চিত্তের পথ আগলে তার অন্তর্নিহিত অদৃশ্য সম্পদ কেড়ে নেয়।

তথাপি এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঈমান নিছক অনুভূতির চেয়ে বড়। ঈমানে খানিকটা জ্ঞানাত্মক উপাদানও রয়েছে। ধর্মের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী ও মরমবাদী- এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অস্তিত্ব দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মের যা মূল বস্তু, আইডিয়া হচ্ছে তার অন্যতম। এ ছাড়াও অধ্যাপক হোয়াইটহেডের সংজ্ঞানুযায়ী ধর্ম তার মতবাদের দিক দিয়ে কতগুলো সাধারণ সত্যের বিন্যাস, যা অকপটভাবে পালন এবং তীব্রভাবে অনুধাবন করলে চরিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এখন যেহেতু ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভেতর ও বাইরের জীবন প্রবাহের রূপায়ণ ও নিয়ন্ত্রণ, সেই জন্য ধর্মের মূল সাধারণ সত্যগুলো সম্বন্ধে কোনো কিছু অমীমাংসিত না থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় সংশয়যুক্ত নীতির উপর ভিত্তি করে কেউই জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সাহস পেতো না।

বস্তুত, ধর্মের যা আসল কাজ সে হিসেবে তার মূলনীতি বিজ্ঞানের নীতির চেয়েও দৃঢ়তর যুক্তির উপর সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞান যুক্তিবাদী তত্ত্বদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে; প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান এ-ই এতদিন করে আসছে। মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় যেসব দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তাদের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাকে ধর্ম উপেক্ষা করতে পারে না; আর যে পরিবেশের মধ্যে মানুষকে জীবন যাপন করতে হয়, তারও সমর্থন না করে পারে না। সে জন্যেই সূক্ষ্মদর্শী অধ্যাপক হোয়াইটহেড মন্তব্য করেন : 'ধর্মের যুগ যুক্তিবাদেরই যুগ'। কিন্তু ধর্মকে যুক্তির গণ্ডিতে নিয়ে আসার অর্থ এই নয়, দর্শনের স্থান ধর্মের ঊর্ধ্বে বলে স্বীকার করা। ধর্মকে বিচার করার অধিকার দর্শনের আছে বটে; কিন্তু ধর্ম-ব্যাপারে দর্শনের যা বিচার্য তার প্রকৃতি এমন যে, সে বিষয়কে কেবল ধর্মের নিজ শর্ত মুতাবিকই বিচার করা চলে, অন্য কোনো পথে তা দর্শনের আওতায় আসে না। ধর্মের বিচারকালে দর্শন তার তথ্যসমূহের মধ্যে ধর্মকে নিম্নতর স্থান দিতে পারে না। ধর্ম কোনো বিভাগবিশেষের ব্যাপার নয়, ধর্ম সমগ্র মানুষেরই একটি অভিব্যক্তি। কাজেই ধর্মের মূল্য নির্ধারণে দর্শনকে স্বীকার করতেই হবে যে, ধর্মই সকলের কেন্দ্রস্থল এবং চিন্তাজগতে সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় ধর্মকে কেন্দ্র গণ্য করা ছাড়া দর্শনের গত্যন্তর নেই। আবার চিন্তা ও স্বজ্ঞাকে পরস্পরবিরোধী ভাববারও কোনো কারণ নেই। একই মূল থেকে উভয়ের উৎপত্তি এবং উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক। এদের একটি